১৫ই অগাষ্ট ২০১০: আমার ভাবনা

সিরাজুস সালেকিন

আমরা যারা প্রবাসী তারা কি করে যে মেঘে মেঘে বেলা পার করে দি - বুঝতেই পারিনা। মাঝে মাঝেই ভাবি, যে দেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সে দেশেই যদি জীবনের শেষকটা দিন পার করে দিতে পারতাম! আমার তো মনে হয় এ বেদনা, এ আকুলতা, এ চাওয়া বেশীর ভাগ প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীর। অনেকেই ফিরে যান, তাদের দেখে হিংসে হয়, কি ভাগ্যবানই না তারা!! কিন্তু দেশের যে অবস্থা শুনি-দেখি - তাতে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে ভয় হয়। যানজট, বিদুৎ এর অব্যাবস্থা, খুন-ছিনতাই, জিনিসপত্রের আকাশ ছোয়া দাম, ব্যায়বহুল পড়া-শোনা, জীবন-যাত্রার মান - এসব কথা ভাবলে আবার মনটা দমে যায়। যে সব তরুনদের হাতে থাকবে বই, প্রানোচ্ছল হয়ে থাকবে ওরা সারাক্ষন, তাদের হাতে বোমা, অস্ত্র, ড্রাগস। যে কারণে আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়েছিল, যে স্বপ্ন ছিল আমাদের, তার থেকে আমরা এখন অনেক দূরে। মৌলবাদ এখন বেশ প্রবল, নানা রকমের ধর্মভিত্তিক সংগঠনে ভরে গেছে দেশটা। এ ছাড়া দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে দেশে মাদ্রাসা অনেক বেশি। গত ২০ বছরে যে হারে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখি - তা আগে বাংলাদেশে কখনো দেখিনি। এসবের কারণ একটাই বলে আমার মনে হয় - তা হচ্ছে সুস্থ রাজনীতিহীনতা। আর এটা শুরু হয় পচাত্তরের পর থেকে। যেদিন বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন, চার-জাতীয় নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হোলো, সেদিন থেকেই আমাদের পতন শুরু। আমাদের চেতনার স্খলন শুরু তখন থেকে।

৭১ এ পাকিস্তানী শাসকদের শোষন আর বঞ্চনার বিরেদ্ধেই ছিল বাঙালির লড়াই। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পর সেই শোষন আর বঞ্চনা এখনো আছে - আর তা ওদের চেয়ে অনেক গুন বেশী। আর তা করছি আমরা বাঙালিরাই। তবে এসব একান্তই আমার ভাবনা। অনেকেই এর সাথে দ্বিমত পোষন করতে পারেন। যে দেশে জাতির জনককে অপমান, অস্বীকার করা হয় খোদ সংসদে - সে দেশের ছেলে-মেয়েরা কি শিখবে? কোন আদর্শ নিয়ে তারা বড় হবে? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় - আমরা কি পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়েছি? বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষ কি সামাজিক, অর্থনৈতির ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছে? গত ৩৯ বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে দেশের অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র টিকে থাকার সংগ্রামে ব্যাস্ত। মধ্যবিত্ত সমাজ - যারা নাকি সমাজ গড়তো, সমাজ বদলাতো - তারা নিম্নবিত্তে পরিণত হয়েছে - নয়তো দেশ ছেড়েছে। আর একটা বেশ বড় অংশ ক্রমাগত বিত্তশালী হচ্ছে। এই বিত্তশালী অংশই প্রসাশন, রাজনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনে জড়িত। এরা তো কখনো দেশের সাধারন মানুষের কথা ভাবেনি। ফলে সমাজে বৈষম্য বেড়েছে, বঞ্চনা বেড়েছে, মানুষের নৈতিকতা অনেক নীচে নেমে এসেছে। ২০০৭ এর জানুয়ারীতে যখন সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলো, তখন এইসব বিত্তবান শ্রেণীর অনেকের ওপর আইনের খড়গ নেমে আসে। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছি কি বিপুল পরিমান অর্থ এরা আত্মসাৎ করেছে। একসময় এরা দেশের শাসক ছিল, অথচ দেশের কথা এরা একটুও ভাবেনি। শুধু নিজেদের আখের গুছিয়েছে। অথচ এই আধিপত্যবাদ শ্রেণীর বিরুদ্ধেই বাঙালি অস্ত্র তুলে নিয়েছিল ১৯৭১ এ। এদের থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমরা কখনো এগুতে পারবোনা। জানিনা কবে সেদিন আসবে।

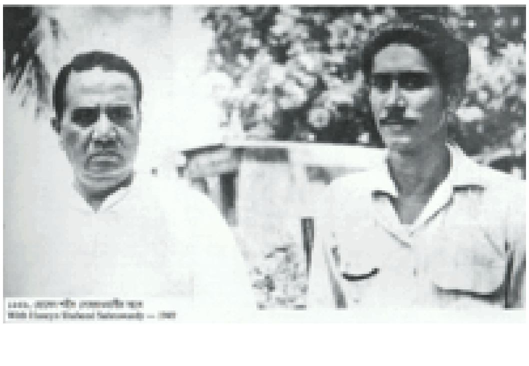

পচাত্তরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষের ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনীতি, খেলাধুলা আর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ এর সাধারন সম্পাদক, নাট্যচক্রের সদস্য, ভিক্টোরিয়া ক্লাবে (১ম ডিভিশন) ক্রিকেট খেলছি, ইউনিভার্সিটিতেও ক্রিকেট খেলছি।

এছাড়া তখন ছায়ানটে গানও শিখছি। সব মিলিয়ে ক্লাশ শেষ হবার পরই লেগে পড়তাম এসব কাজে। ছুটির দিন বলে আমার কোন দিন ছিল না। অবসর কাকে বলে জানতাম না।

তখন ডাকসু চালাচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। সেলিম ভাই (মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম) ডাকসুর সহ-সভাপতি। বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয়পাত্র। হামিদ ভাই (ম, হামিদ - বর্তমানে টেলিভিশন প্রযোজক) ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। মূলত হামিদ ভাই এর সাথেই কেটে যেত আমার সারাটা দিন। ওনারই তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হোতো। ছাত্র ইউনিয়ন, ডাকসু, নাট্যচক্র আর সংস্কৃতি সংসদ এর যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেই কেটে যেত সারাটা দিন। মূলত: আমার সাংগঠনিক শিক্ষার হাতেখড়ি হামিদ ভাই এর কাছে। পরে ছায়ানটে ওয়াহিদ ভাই এর কাছেও শিখেছি অনেককিছু। এসময় আমি যাদেরকে কাছে পেয়েছি তারা হচ্ছেন খ ম হারুন (বর্তমানে টেলিভিশন প্রযোজক), সালেক খান (টেলিভিশনে বাংলা সংবাদ পাঠক, পরে টেলিভিশন প্রযোজক, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী), ভাস্বর বন্দোপাধ্যায় (বর্তমানে টেলিভিশন প্রযোজক), কামরুল (আহসান খান) ভাই, রুদ্র মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, কাজল দেবনাথ, মানজারে হাসিন মুরাদ (স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র নির্মাতা), নিগার সুলতানা, শামীমা খান, ইকবাল আনোয়ার (নাট্যকর্মী), দুলাল দেবনাথ (নাট্যকর্মী), কবি জাফর ওয়াজেদ (ছাত্রলীগ করতো), কবি কামাল চৌধুরী (ছাত্রলীগ করতো, বর্তমানে সচিব), মৃণাল চক্রবর্ত্তী, তানভির মোকাম্মেল (চিত্র নির্মাতা) এবং আরো অনেকে যাদের নাম এখন মনে করতে পারছিনা।

১৫ই অগাষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। কয়েকমাস আগে থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়লাম। ১৪ই অগাষ্ট বিকেলে আমি, হামিদ ভাই, ইকবাল, দুলাল দা, আরো কয়েকজন মিলে শেষবারের মত টি এস সি গেলাম। জামান স্যারের সাথে দেখা করে আগামীকাল করণীয় সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না - তা নিয়ে আলোচনা হোলো। বের হবার পথে আমরা টি এস সি মিলনায়তনে গেলাম। ওখানে 'আঠার বছরের যৌবন' নাটকটার মহড়া হচ্ছিল। যারা অভিনয় করছিল তাদের মধ্যে শেখ কামাল, রাজু ভাই, সাজ্জাদ ভাই (সাজ্জাদ খান), সবুজ ভাই (খায়রুল আলম) , কাদের ভাই (আবদুল কাদের) - এদের কথা মনে আছে। কিছুক্ষন ওখানে থেকে আমরা বের হয়ে আসলাম। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাজ সাজ রব। সবার থেকে বিদায় নিয়ে অনেকদিন পর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হোলাম। মনে মনে চিন্তা করছিলাম আগামীকাল কোন কাপড়টা পরবো। খুব খুশীমনে গুন গুন করে গান করছিলাম আর হাটছিলাম। আমার বাসা ইস্কাটন গার্ডেন - হেটে হেটেই যাচ্ছিলাম। পথে আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েদেরকে দেখলাম তারা তাদের এলাকাটা সাজাচ্ছে, বেশ জমজমাট পরিবেশ। পি জি হাসপাতালের সামনে থেকে একটা রিকশা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। অনেকদিন পর আব্বা-আম্মাকে দেখলাম। অনেকদিন পর ভালো করে খেলাম, খেতে খেতে আব্বা-আম্মার সাথে গল্প করলাম আগামীকাল কি কি হবে, বঙ্গবন্ধুকে দেখবো - কি যে খুশী!!!

কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে ইস্ত্রী করে ঘুমাতে গেলাম - আগামীকাল সকাল সকাল পৌছাতে হবে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা - যখন আব্বার ডাকে জাগলাম - তখন ভোর ৫টা, বাইরে আবছা অন্ধকার। আব্বা চিৎকার করে বললেন- বঙ্গবন্ধুকে ওরা মেরে ফেলেছে। আব্বার বিঋন্ন মুখ, চোখে পানি, আম্মাও উঠে এসেছেন। পাশের বাসার চাচা এসে খবরটা দিলেন। তিনি তখন বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব। ওনার সচিব ওনাকে ফোন করে জানিয়েছেন। খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাইরে বেরিয়ে দেখি আশপাশের অনেক বাড়ীর আলো জ্বলছে, রাস্তায় মানুষের জটলা - এদের মধ্যে কয়েকজন পাড়ার ছেলে। ওদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করলাম। ওদের কাছে শুনলাম - বঙ্গবন্ধুকে নাকি ভোররাতে সপরিবারে হত্যা করেছে সেনাবাহীনির কিছু সদস্য। অনেকে নাকি গুলি-বিস্ফোরণের শব্দও শুনেছে। রেডিও খুললাম বাসায় এসে - খুনী মেজর ডালিম এর ঘোষনা করছিলো - আমি মেজর ডালিম বলছি - শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হোলো শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। একটু পরে আবার ঘোষনা করলো - ক্ষমতা গ্রহনের সময় শেখ মুজিব মারা গেছেন। আব্বা আর আমি ঠিক করলাম মুজিবের বাসার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবো। কাপড় বদলে আমরা বের হয়ে পড়লাম। পরিবাগের কাছাকাছি রেডিও অফিসের সামনে কয়েকটা সেনাবাহীনির গাড়ী দেখতে পেলাম। কোনমতে ওদের এড়িয়ে আমরা হাতিরপুলের কাথাকাছি চলে আসলাম। রাস্তায় খুব একটা মানুষ নাই, যারাও বা ছিলেন, তাদের সবাইকেই বিষন্ন আর উদ্বিগ্ন মনে হোলো। অনেকে আব্বাকে দেখে চিনতে পারলেন, একজন দৌড়ে এসে আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। চেনা চেনা মনে হোলো, বাংলা একাডেমীতে কাজ করতেন তিনি। অলি-গলি পার হয়ে অবশেষে গ্রীন রোডের কাছে চলে আসলাম। রাস্তা পার হবো - এমন সময় সেনাবাহীনির এক গাড়ীর বহরের সামনে এসে

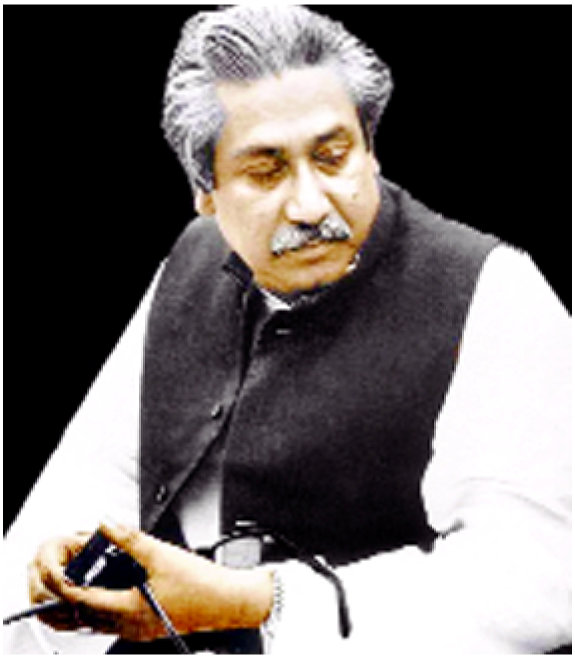

পড়লাম। একজন জওয়ান এসে খুব উদ্ধত ভঙ্গিতে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলো - কারফিউ এর মধ্যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আব্বা বললেন বাজার করতে যাচ্ছি। বেশ জোরে এক ধমক দিয়ে বললেন - এক্ষুনি বাসায় চলে যান, দেশের অবস্থা ভালো না। অগত্যা বাসার পথে রওনা হোলাম। পথে আরো ২ বার সেনাবাহীনির সামনা-সামনি পড়লাম, ভালোয় ভালোয় ছাড়া পেয়ে বাসায় ফিরলাম। আব্বা আবার রেডিওর সামনে বসলেন, যতবারই বঙ্গবন্ধু মারা যাবার খবর শুনছেন, ততবারই কাঁদছেন। আম্মাও তাই। আমিও আমার ঘরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়!! কিছুই আর করা হোলো না, করা গেল না।

তখন সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। ভাবলাম উনি হয়তো কিছু একটা করবেন, আপেক্ষা করছিলাম কখন সেনাবাহিনী ওই সব ঘাতকদেরকে আঘাত হানবেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তিনি কিছুই করলেন না। বরং ১৫ই অগাষ্ট সকালে কর্নেল জামিল বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন নিজের গাড়ীতে, তখন বিদ্রোহী সেনাবাহীনির সদস্যদের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। তা ছাড়া তখন রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ। আমরা সবাই ভাবলাম রক্ষীবাহিনী নিশ্চয়ই পাল্টা ব্যাবস্থা নেবে খুনী ঘাতকদের বিরুদ্ধে - কিন্তু কিছুই হোলো না। সবচেয়ে আশ্চর্য হোলাম যখন এই সুবিধাবাদী জেনারেল শফিউল্লাহ আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন। এ সময় আওয়ামী লীগের ওপর মহলেও এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হোয়েছে। আসলেই আমরা সবকিছু ভুলে যাই তাড়াতাড়ি।

আমার জানা মতে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পর পরই একমাত্র বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীই তার দল-বল নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল পচাত্তরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। তৎকালীন সেনাবাহীনির সাথে একসময় ওদের সামনাসামনি যুদ্ধ হয়, কাদের সিদ্দিকীর পক্ষে ৭২ জন যোদ্ধা প্রাণ হারান। পরে ওনারা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অনেক পরে ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে কাদের সিদ্দিকী ও তার দল নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

খুকী আপার কথা ভাবছিলাম। মাত্র কিছুদিন আগে শেখ কামালের সাথে খুকী আপার (সুলতানা) বিয়ে হোলো। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অবস্থায় নিয়মিত এ্যাথলেটিকস এ অংশ নিতাম। সেটা ১৯৭৪ সালের কথা। জহুরুল হক হলের সাথে যুক্ত ছিলাম - টানা ছ'বছর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় ও অংশ নিতাম এবং ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় ও লং-জাম্পে প্রথম বা দ্বিতীয় হোতাম। একবার জাতীয় অলিম্পিক এ মোহামাডান দল আমাকে ভাড়া করলো ওদের হয়ে দৌড়াবার জন্য এবং আমরা ১০০ মিটার রিলে রেসে তৃতীয় হোলাম। তো সেই সময় আমরা নিয়মিত অনুশীলন করতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (জিমনেসিয়ামের পাশের) মাঠে। বছরের একটা দিনও আমি এই অনুশীলন বাদ দিই নি। সেই সময় আমাদের সাথে একই মাঠে অনুশীলন করতেন খুকী আপা। উনি লং জাম্প এ সমস্ত-পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। খুকী আপা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলোজীর ছাত্রী ছিলেন।

খুকী আপা

গান-বাজনা আর খেলাধূলায় সেরা হবার সুবাদে আমি তখন বেশ পরিচিত। আস্তে আস্তে খুকী আপার সাথেও পরিচয় হোলো, একসাথেই দৌড়াতাম আমরা। আমরা একে অপরের মাঠে আসার জন্য অপেক্ষা করতাম। উনি না আসলে আমি অনুশীলন শুরু করতাম না - উনিও ঠিক তাই করতেন। একরকমের শ্রদ্ধাবোধ ছিল খুকী আপার প্রতি। মাঠে সবাই খুকী আপাকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন তার অমায়িক মানসিকতার জন্য। খুকী আপার বড় ভাই খোকন ভাইও তখন আমাদের সাথে থাকতেন, উনি তখন হাই-জাম্পে বাংলাদেশের সেরা ছিলেন। শেখ কামালের সাথে তার বিয়ে হবে - এটা আমরা সবাই জানতাম।

১৯৭৫ এর জুলাই এ শেখ কামাল এর সাথে খুকী আপার বিয়ে হয়। পরের মাসেই ১৫ই অগাষ্ট তিনি ঘাতকদের হাতে নিহত হন। প্রতিবার ঢাকা গেলে বনানীতে ওনাদের কবর জিয়ারত করতে যাই। একবার ঈদের দিন বনানী কবরস্তানে ওনাদের করব জিয়ারত করছি, একটু পরে খুকী আপার বড় ভাই এর সাথে দেখা হোলো, উনিও এসেছেন খুকী আপার কবর জিয়ারত করতে। কথায় কথায় উনি ওনার রাগ প্রকাশ করলেন - কেউ ওনাদের (বঙ্গবন্ধু পরিবারের) কবর জিয়ারত করতে আসে না বলে। আমিও যতবার গেছি ওখানে - কাউকেই দেখিনি ওখানে। কি আশ্চর্য!!! বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা, মাত্র দশ বছরের ছেলে রাসেল, রোজী, খুকী আপার কবর জিয়ারত করতে বাঙালী আসবেনা - ভাবাও যায় না। আসলে আমরা খুব বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। খুব কম সময় লাগে আমাদের ভুলে যেতে।

বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতারা খন্দকার মোশতাকের সাথে হাত মেলালেন, মন্ত্রীসভার সদস্য হোলেন। কি নির্লজ্জভাবে তারা রেডিও-টেলিভিশনে মোশতাক সরকারের গুনগান করলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন এখনো হাসিনার আশেপাশে দেখতে পাই। বহাল তবিয়তে আছেন, প্রচুর অর্থকড়ি আত্মসাৎ করেছেন, এখনো বড় বড় কথা বলেন। সব-সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ বলেই এটা সম্ভব। আর কোন এক সংসদে অধিবেশনে সেইসব দুষ্টচক্রদের চিহ্নিত করেছিলেন কাদের সিদ্দিকী। পরিণামে তাকে সরিয়ে দেয়া হোলো দল থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ভাগ হোয়ে গেল।

সাম্প্রতিককালে এরকম একটি ঘটনা আবার ঘটলো। আমাদের শ্রদ্ধেয় তাজউদ্দিন আহমেদ এর ছেলে সোহেল তাজকে দল থেকে, মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হোলো। কেন চলে যেতে হোলো তা আমরা অনেকেই জানি বা আন্দাজ করে নিতে পারি। ঘটনাটা খুবই দুখ:জনক। এতবছর একসাথে থেকেও বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিনকে চিনতে পারেননি। ওনার মত রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছে বলে আমার মনে হয়। উনি বেঁচে থাকলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদশের ইতিহাসটা হয়তো অন্যরকম হোতো। হয়তো বঙ্গবন্ধুকেও এভাবে প্রাণ দিতে হোতো না। আমার তো মনে হয় সোহেল তাজ যদি তার কাজ ঠিকমত করে যেতে পারতেন, তবে তা সাধারন মানুষের জন্য অবশ্যই ইতিবাচক একটা পরিবর্তন বয়ে আনতে পারতো। আমরা সাধারন মানুষরা তো এটাই চাই। সেটা যে এখনও হচ্ছেনা এটা ভাবলেই হতাশায় নিমজ্জিত হই আমি, সেই সাথে বাংলাদেশের সাধারন মানুষ।

আস্তে আস্তে সবকিছু জানা গেল। কারা কারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলেন, কি কারণে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল এবং কেন এর প্রতিবাদে কেউ (জেনারেল শফিউল্লাহ, তোফায়েল, রাজ্জাক, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা) এগিয়ে এল না - সব জানলাম। সেই কালো রাতে আমরা আমদের জাতির পিতা হারালাম। যার কারণে আজকের বাংলাদেশ - তাকে ঘাতকরা কি নির্মমভাবেই না হত্যা করলো। বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় কবর দিতে সাহস পেলনা ঘাতক সামরিক জান্তা। তাই ১৬ই অগাষ্ট ১২/১৩ জনের একটি সামরিক দল হেলিকপ্টারে করে জাতির পিতার মৃতদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায়। হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে কফিন সহ বঙ্গবন্ধুর লাশ সরাসরি মাটি চাপা দিতে চাইলে স্থানীয় মসজিদের ইমাম এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন লাশের গোসল, কাফন ও জানাজা ছাড়া এ লাশ দাফন করা যাবে না। ঘাতক সামরিক বাহীনির সদস্যরা কি ভেবে রাজী হোলো। তখন টুঙ্গীপাড়ার সাহসী সন্তান আবদুল হাই শেখ, সোহরাব মাষ্টার, আকবর গাজী, নূরুল হক ও আবদুল মান্নান কফিন খোলেন। তারা দেখেন তাদের প্রানপ্রিয় খোকার (বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম) বুলেটবিদ্ধ লাশ, চিরতরে ঘুমিয়ে আছে বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তারা লক্ষ করেন যে লাশের বুক বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গেছে, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নেই আর দু-পায়ের রগ কাটা। মোট ২৯টি বুলেটের ক্ষতচিহ্ন ছিল তাঁর সারা গায়ে। ৫৭০ সাবান দিয়ে পরম মমতায় তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে গোসল করান, পরে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে সাদা শাড়ী এনে তাঁকে কাফন পরানো হয়, মসজিদের ইমাম সাহেব জানাজা পড়ান পরে তাকে সেখানে সমাহিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিহত বাকী সবাইকে বনানী কবরস্তানে মাটি দেয়া হয়।

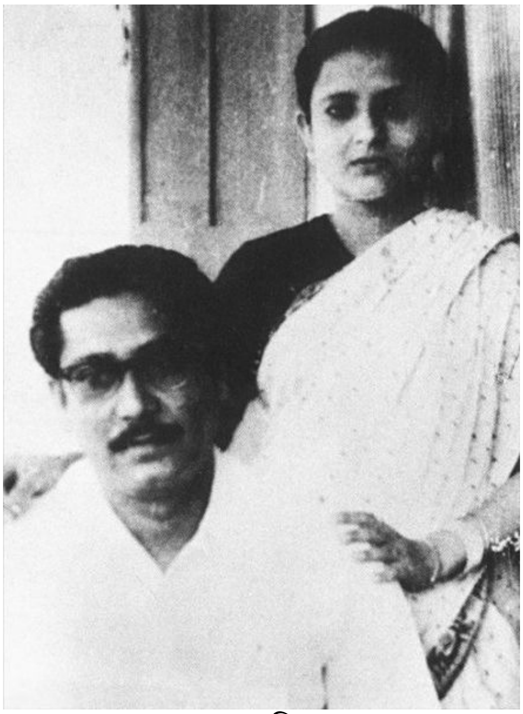

বঙ্গবন্ধু ও ফজিলাতুন্নেসা

এর মধ্যে ৩রা নভেম্বর জেলখানার মধ্যে হত্যা করলো চারজন জাতীয় নেতাকে। খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে হত্যা করা হোলো তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে। ৩রা নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহীনির কিছু অংশ ঘাতক মুশতাক-ডালিম-ফারুকদের হাত থেকে ক্ষমতা নেয়। এসময় ঘাতকরা এক রাতের মধ্যেই দেশ ছেড়ে পালায়। এর চার দিনের মাথায় ৭ই নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ও তার অনুসারীদের হত্যা করে তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবের দোহাই দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতার আসেন।

এর ঠিক পরপরই আর একটা জিনিস খুব চোখে পড়লো - উই পোকার মত জামাত-শিবির বের হয়ে আসলো গর্ত থেকে, জিয়াউর রহমানের বদৌলতে ওরা আবার সক্রিয় হোয়ে উঠলো, নরঘাতক গোলাম আজম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেল, স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজুর রহমান স্বাধীনতার মাত্র ৫ বছর পরেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বনে গেল। সামরিক বাহীনিতে কর্মরত অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে এসময় জিয়াউর রহমান হত্যা করেন। হায়নার মত জামাত-শিবির ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘুদের ওপর। আস্তে আস্তে প্রশাসন বদলে যেতে শুরু করলো, স্বাধীনতার ইতিহাস বদলে যেতে শুরু করলো, ক্রমে

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির পরাজয় হোলো। জামাতে ইসলামের নরপশু সেই নিজামী, মুজাহিদ সংসদ সদস্য হোলো। ওরা স্বাধীন বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী, ওদের গাড়ীতে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে - এটা কি ভাবা যায়?, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম হারানো, মুক্তিযোদ্ধা ভাইএর বুকের রক্ত ঢেলে দেশকে স্বাধীন করা - সব যেন বৃথা হোয়ে গেল।

এর পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি - সবই বদলে গেল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বদলে গেল, সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি যে স্কুলে ছেলে-মেয়ের পাঠ্যপুস্তকে এইসব মিথ্যে ইতিহাস ঢুকিয়ে দেয়া হোলো। একাত্তরে রাজাকার-আলবদররা যেমন আমাদের বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে জাতিকে মেধাশুন্য করতে চেয়েছিল, এরা তার চেয়েও বড় অপরাধ করলো - সারা দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে মিথ্যে ইতিহাস শেখালো। বড় হয়ে ওরা যখন সত্যি ইতিহাস জানবে - তখন ওরা কি আমাদেরকে এর জন্য দায়ী করবে না? পৃথীবির কোন দেশে এমনটি আর দেখা যাবে কি না সন্দেহ আছে। আসলে যারা দেশ চালায় - তাদের নূন্যতম একটা শিক্ষা দরকার। ওদের কাছ থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি?

আমার এ লেখা একান্তই আমার নিজস্ব ভাবনা থেকে, এর সাথে রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই। নিজে রাজনীতি করতাম একসময়, অবশ্যই বাম রাজনীতি। এখানে আসার আগে পর্যন্ত যুক্ত ছিলাম। যে অবস্থায় দেশ ছেড়ে এসেছিলাম, সে রাজনীতি এখন আর নেই। আর বাম রাজনীতি তো আরো নষ্ট হয়ে গেছে। যাদেরকে দেখে নিজেকে বদলাতে চেতাম, যাদের কথা শুনে মনে হোতো - এইতো আসল কথা, মানুষের মুক্তির কথা, বিপ্লব তো আসছে বলে- আজকাল তাদের অবস্থা দেখে করুণা হয়, দু:খ হয়। তবে দু-একজন এখনো আছেন যারা নিজেকে বিকিয়ে দেন নি। তাদেরকে এখনো শ্রদ্ধা করি, যোগাযোগ রাখি। এখনকার রাজনীতি দেখে মনে হয় - এটা একধরনের ব্যাবসা। অবশ্য এ ধারনা আমার একার নয় - কারন দেশের অধিকাংশ মানুষই তো তা দেখতে পাচ্ছে, দেখে আসছে। এর সপক্ষে হাজারো উদাহরন দেয়া যায়। সেখানে দেশপ্রেমের প্রয়োজন নেই, সাধারান মানুষের দু:খ-দূর্দশা বোঝার প্রয়োজন নেই, অর্থ আর পেশীর জোরেই রাজনীতি চলে। যারা আমাদের দেশের রাজনীতির সংস্কার চান, জবাবদিহিতার সপক্ষে কথা বলেন, তারা কোনঠাসা হয়ে রয়েছেন। একমাত্র তারাই সামনে আসতে পারেন যারা নেতা-নেত্রীর সুনজরে থাকেন। দলের জন্য, দেশের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, সততা, আদর্শ, দেশের মানুষর জন্য মমতা, মূল্যবোধ, - এসব আজকাল আর তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আমি বিশ্বাস করি এ অবস্থার পরিবর্তন একদিন হবেই। শুধু ব্যাবসায়ী আর রাজনিতীবিদরাই নয়, দেশের সব মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবে। শিক্ষিত, আদর্শবাণ, সৎ ও দেশপ্রেমিক রাজনিতীবিদরাই দেশ চালাবে - বাকীরা প্রত্যাক্ষাত হবে। শুধু অর্থে বিত্তবাণ না হয়ে জ্ঞ্যানে-গরিমায় বিত্তবাণ হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। পৃথিবীর বুকে বাঙালি আবার মাথা উঁচু করে দাড়াবে। কায়মনে বাঙালি হবে।

১৫ই অগাষ্ঠের সেই ক্ষত আমার এখনও আছে, ভুলিনি আজো। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঘাতকরা শুধু মুজিবকেই মেরে ফেলতে চাননি, একটা আদর্শকেও তারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। মুজিব মরে নি, সে বেঁচে আছে আমাদের প্রাণশক্তিতে, তাকে ঘিরেই আমরা আবর্তিত হবো চিরদিন। জাতির পিতা তো চিরদিন পিতা হয়েই থাকেন, বটবৃক্ষের মতন, অদৃশ্য এক ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখেন সন্তানদের। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, পলাতক আসামীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করা হবে। এতদিন পরে যেন বাঙালি একটা বিরাট দায় থেকে মুক্তি হোলো। এখন যুদ্ধাপরাধীদের হত্যার বিচার শুরু হয়েছে, এটাও আমাদের অনেকদিনের চাওয়া। মানবতাবোরোধী কোন অপরাধই যেন ভবিষ্যাতে বিনা বিচারে পার না পায় - এটা তারই একটা দৃঢ় পদক্ষেপ। নিজামী-সাঈদী-মুজাহিদদের মত নরপশুরা একটা স্বাধীন সমাজে বসবাস করার অধিকার রাখেনা, ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়, তবেই সমাজ বাঁচে, মানুষ বাঁচে। কেউ যেন কোনদিন আর ধর্মের নামে রাজনীতি না করতে পারে - সেটাই আমাদের কাম্য। একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি হবে প্রগতিশীল, আধুনিক। আমরা পুরোনোতে আর ফিরে যেতে চাই না। কি পাইনি তার হিসেব মেলাতে আমরা আর রাজী নই - কি পেতে চলেছি - সেটাই হোক আমাদের আগামী দিনের ভাবনা।

আজকে পৃথিবীর বুকে বাঙালির যে অবস্থান - সমস্ত বিশ্বে বিশ্ববাঙালির যে গৌববময় পদচারণা - তার মূলে বঙ্গবন্ধু। মৃত্যুকে তিনি অনেকবার তুচ্ছ করেছেন। পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালিদের অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তাঁরই নেতৃত্বে। আমাদের স্বাধীনতা আমদের চিত্তে, চেতনায়, কল্পনায়, কর্মে এক আশ্চর্যরকম প্রত্যয় এনেছে।

তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হয়ে - অমর, অব্যয় আর অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকুন সব বাঙালির হৃদয়ে। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক।